Contents

নির্বাচিত ৮টি সূরার
তাফসীর
রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রিকালে যখন বিছানায় যেতেন তখন এ তিনটি সূরা (সূরা আল-ফালাক্ব, আন্-নাস ও ইখলাস) পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌঁছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে ছোঁয়া দিতেন। (বুখারী হাঃ ৫০১৭)
রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক নামাযের পরে সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন্-নাস পড়তে। [আহমাদ ও আবূ দাউদের বর্ণনায় সূরা আল-ফালাক্ব, আন্-নাস ও ইখলাসও পড়তে হবে]
(সহীহ মিশকাত হাঃ ৯৬৯)
হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (হাদীস বিভাগ) মাদীনা, সাঊদী আরব

নির্বাচিত ৮টি সূরার তাফসীর

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (হাদীস বিভাগ), মাদীনা, সৌদী আরব

✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

✪ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রিকালে যখন বিছানায় যেতেন তখন এ তিনটি সূরা (সূরা আল-ফালাক্ব, আন্-নাস ও ইখলাস) পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে ছোঁয়া দিতেন। (বুখারী হাঃ ৫০১৭)

✪ রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক নামাযের পরে সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন্-নাস পড়তে। [আহমাদ ও আবূদাউদের বর্ণনায় সূরা আল-ফালাক্ব, আন্-নাস ও ইখলাসও পড়তে হবে] (সহীহ মিশকাত হাঃ ৯৬৯)

নির্বাচিত ৮টি সূরার তাফসীর
হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (হাফেয হোসেন)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (হাদীস বিভাগ), মাদীনা, সৌদী আরব

প্রকাশনায় ঃ
সাবিহা
১৭৫০, স্টেভিনস্‌কি এভি ব্রোসার্ড ৫৪×২৫৪, কানাডা

ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনায় ঃ
আবুল কাসিম মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান জিলানী

প্রথম প্রকাশ ঃ
রবিউস সানি ১৪৩০ হিজরী
এপ্রিল ২০০৯ ঈসায়ী
চৈত্র ১৪১৫ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল,
ঢাকা-১১০০, মোবাইল ঃ ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০

মুদ্রণে ঃ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২, হেমন্দ্র দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩১/= (একত্রিশ) টাকা মাত্র

Published by Sabiha, 1750 Stavinski Ave Brossard 54×254, Canada. 1st Edition April 2009. Price: Tk. 31/=, US$: 1
ISBN No.: 984-605-085-2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অগণিত প্রশংসা, যাঁর অসীম অনুগ্রহে "নির্বাচিত ৭টি সূরার তাফসীর" প্রকাশ করার সুযোগ হলো।

মানুষ যদি এ নির্বাচিত সূরার অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করে আল-কুরআনে বর্ণিত কথার সঠিক তাফসীর বুঝাতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে ও সৎপথে, ধর্মের পথে জীবনকে পরিচালিত করে তবেই মনে করবো আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ তাফসীর আল-মাদানী থেকে নির্বাচিত কয়েকটি অতি মূল্যবান সূরা প্রকাশ অবশ্যই একটি মহৎ উদ্যোগ।

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। এ কিতাব ক্বিয়ামাত পর্যন্ত মানব জাতির একমাত্র হিদায়াত গ্রন্থ, তাই সকল মুসলিমেরই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থ বুঝার চেষ্টা করা আবশ্যক। সে চিন্তায় বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থের ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন আবুল কাসিম মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান জিলানী।

নির্ভরযোগ্য ও সহজ-সরল বাংলা তরজমা ও তাফসীর হিসেবে প্রকাশিত এ গ্রন্থ দেশের সকল মহলের নিকট প্রশংসিত ও গ্রহণযোগ্য পাবে ইনশাআল্লাহ।

যারা আমাদের এ কাজে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে অত্র গ্রন্থের প্রকাশিকা সাবিহা আপা (কানাডা) এবং আবুল কাসিম মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান জিলানী সাহেবকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্যে যে, তিনি আমাদের এ পরিশ্রমের ফসল অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছেন। তাদের উদ্যোগ এবং উপর্যুপুরী আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

উক্ত গ্রন্থের প্রকাশনার বেলায় আমি আল্লাহ্র দরবারে তাদের জন্যে কল্যাণ, মঙ্গল ও দু'আ কামনা করছি।

বিশেষ করে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান জিলানীর অনুরোধে যাদের মাগফিরাতের স্মরণ করার আবেদন করা হয়েছে। তারা হচ্ছেন ঃ (১) কাজী রোকেয়া খানম, (২) হাবীবুর রহমান, (৩) আমীর আলী, (৪) আখলাকুজ্জামান ও (৫) ফাহমিদা জামান।

আমি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ কুরআন তাফসীরের প্রচারের বদৌলতে তাদের রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত ও মাগফিরাত বর্ষণ করেন- আমীন॥ আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের জান্নাত নসীব করেন- আমীন॥

পরিশেষে আবেদন, সুধী পাঠকবৃন্দের চোখে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পরে তবে তা জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করা হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ দু'আই করি যে, তিনি যেন আমার এ প্রচেষ্টা কবূল করেন। আর তিনি আমাদেরকে তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সম্পর্কে জানার এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের ত্বরীক্বায় চলার তাওফীক দেন। আমীন॥

[সূরাসমূহের আরবী, বাংলা ও অর্থ-তাফসীরের সূচীপত্র]

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

(١) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ (٣) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ (٤) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ط (٥) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ط (٦) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٧) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ع ۞

সূরা আল-ফাতিহা (মাক্কী)

(আয়াত–৭, রুকূ'–১)

আয়াত–১ ঃ পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আয়াত–২ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর- যিনি সারা জাহানের পালনকর্তা। আয়াত–৩ ঃ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু। আয়াত–৪ ঃ যিনি বিচার দিনের মালিক। আয়াত–৫ ঃ আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আয়াত–৬ ঃ দেখাও আমাদের সরল-সোজা পথ। আয়াত–৭ ঃ তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের উপর তোমার গজব পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা আল-ফাতিহা-এর তাফসীর

এ সূরাটির নাম 'সূরাতুল ফাতিহা'। কোন কিছু আরম্ভ করার নাম 'ফাতিহা' বা প্রারম্ভিকা। কুরআন মাজীদে এ সূরাকে প্রথমে আনা হয়েছে বলে সূরাটির নামকরণ 'আল-ফাতিহাহ্' করা হয়েছে। এছাড়াও নামাযের মধ্যে এ সূরাটির দ্বারাই কিরাআত আরম্ভ করা হয়, এটাও এ নামকরণের একটি কারণ।

এ সূরাটিকে 'সূরাতুল হামদ্' ও 'সূরাতুস্ সালাত'ও বলা হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ 'আমি নামাযকে (অর্থাৎ ফাতিহাকে) আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করে ভাগ করে দিয়েছি।' যখন বান্দা বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।'

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা যায়, সূরাতুল ফাতিহাকে 'সূরাতুস্ সালাত'ও বলা হয়ে থাকে। কেননা এ সূরাটি নামাযের মধ্যে পাঠ করা শর্ত রয়েছে। এ সূরার অপর একটি নাম হচ্ছে 'সূরাতুশ্ শিফা'। দারিমীর মধ্যে আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত, সূরাতুল ফাতিহা প্রত্যেক বিষক্রিয়ায় আরোগ্যদানকারী। এর আর একটি নাম 'সূরাতুর রুকিয়্যাহ'। আবূ সা'ঈদ (রাঃ) সাপে কাটা রুগীর উপর ফুঁ দিলে সে ভাল হয়ে যেত। এ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ এটা যে রুকিয়্যাহ (অর্থাৎ পড়ে ফুঁ দেয়ার সূরা) তা তুমি কিভাবে জানলে? (ইবনু কাসীর)

ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর সহীহুল বুখারীর 'কিতাবুত্ তাফসীর' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, অত্র সূরাটির নাম 'উম্মুল কিতাব' (কুরআনের মা) রাখার কারণ হলো, কুরআন মাজীদ এ সূরা হতে আরম্ভ হয়ে থাকে এবং নামাযের কিরাআত এ সূরা থেকেই আরম্ভ হয়।

যদিও সূরা 'ইক্বরা' 'মুয্যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্সির'-এর কয়টি আয়াত সূরাতুল ফাতিহার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল। তথাপি পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে সূরাতুল ফাতিহাই সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন ও মৃত্যু, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরাতুল ফাতিহার দৃষ্টান্ত তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর প্রভৃতি কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কুরআনেও এর দ্বিতীয় নেই।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সূরাতুল ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধ বিশেষ। (তিরমিযী)

সূরাতুল ফাতিহার মর্যাদার ব্যাপারে উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো ব্যতীত অন্যান্য হাদীস হতেও প্রমাণিত হয়।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা সফরে ছিলাম। আমরা কোন এক স্থানে অবতরণ করি। হঠাৎ একজন দাসী এসে বললো, "এ এলাকার গোত্র নেতাকে সাপে কেটেছে। আমাদের লোকেরা এখন সবাই অনুপস্থিত। ঝাড়-ফুঁক দিতে পারে এমন কেউ কি আপনাদের মধ্যে রয়েছে? আমাদের মধ্য হতে একজন তার সাথে গেল। তিনি যে ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন তা আমরা জানতাম না। সেখানে গিয়ে সে ঝাড়-ফুঁক করলে আল্লাহর মহিমায় তৎক্ষণাৎ সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেল। এরপর সে ৩০টি ছাগী দিল এবং আমাদের মেহমানদারীর জন্য প্রচুর পরিমাণে দুধ পাঠিয়ে দিল। সে ফিরে আসলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তোমার কি এ বিদ্যা জানা ছিল? সে বললো ঃ 'আমিতো শুধু সূরাতুল ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়েছি।' আমরা বললাম, এ প্রাপ্ত সম্পদ এখনও স্পর্শ করো না। প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করো। মাদীনায় এসে আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, 'এটা যে ফুঁক দেয়ার সূরা তা সে কি করে জানলো। এ মাল ভাগ করো এবং আমার জন্যও একভাগ রেখো।' **(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)**

ফুঁকদাতা ব্যক্তিটি ছিলেন আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)। **(বুখারী, মুসলিম)**

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিব্‌রীল ('আঃ) বসেছিলেন, এমতাবস্থায় উপর হতে এক বিকট শব্দ আসলো। জিব্‌রীল ('আঃ) উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আজ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেছে যা ইতোপূর্বে কখনও খুলেনি। অতঃপর সেখান হতে একজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, "আপনি খুশি হোন! এমন দু'টি নূর আপনাকে দেয়া হলো যা ইতোপূর্বে আর কাউকে দেয়া হয়নি। তা হলো সূরাতুল ফাতিহা ও সূরা আল-বাক্বারার শেষ আয়াতগুলো।" **(মুসলিম)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে দু'টি লোকের ঝগড়া বেধে যায়। ক্রোধে একজনের নাসিকা ফুলে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "যদি লোকটি أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে নেয় তবে তার রাগ এখনই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" **(মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)**

সহীহ হাদীসের বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, জিব্‌রীল (আঃ) সর্বপ্রথম যখন ওয়াহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন তখন প্রথমে أَعُوْذُ بِاللهِ পড়ার নির্দেশ দেন। তাফসীর ইবনু জারীরে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, প্রথমে জিব্‌রীল ('আঃ) মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট ওয়াহী এনে বলেন ঃ "আ'উযু পড়ুন।" রাসূলুল্লাহ ﷺ استعيذ با لله السميع العليم من الشيطان الرجيم। পাঠ করলেন। জিব্‌রীল ('আঃ) আবার বললেন ঃ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। পাঠ করুন। অতঃপর বলেন ঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ অর্থাৎ যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপনার সে প্রভুর নামে পাঠ করুন। (ইবনু কাসীর)

ইবনু মিরদাওয়াই-এর তাফসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যার মত আয়াত সুলাইমান (আঃ) ছাড়া অন্য কোন নাবীর উপর নাযিল হয়নি। আয়াতটি হচ্ছে ঃ "বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহী-ম"। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন পূর্ব দিকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, বাতাস থেমে যায়, সমুদ্রের ঢেউ থেমে যায়, জীব-জন্তুগুলো কান পেতে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে, আকাশ থেকে আগুনের শিখা নিক্ষিপ্ত হয়ে শয়তানকে বিতাড়ন করে এবং বিশ্বপ্রতিপালক (আল্লাহ) স্বীয় সম্মান ও মর্যাদার কসম করে বলেন ঃ "যে জিনিসের উপর আমার এ নাম নেয়া যাবে তাতে অবশ্যই বারাকাত হবে।" ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন যে, দোযখের ১৯টি দারোগার হাত হতে যে বাঁচতে চায় সে যেন "বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহী-ম" পাঠ করে। বাক্যটিতে ঘটেছে এ ১৯টি অক্ষরের সমাবেশ। প্রত্যেকটি অক্ষর প্রত্যেক ফেরেশতা হতে বাঁচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। (কুরতবী থেকে ইবনু আতিয়াহ্ এটি বর্ণনা করেছেন)

সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, "বিসমিল্লা-হ" দ্বারা যে কাজ আরম্ভ না করা হয়, তা মঙ্গলহীন ও বারাকাতশূন্য থাকে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি অযূর সময় 'বিসমিল্লা-হ' না বলে তার অযূ হয় না। (আহ্‌মাদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "বিসমিল্লা-হ বল, ডান হাতে খানা খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খেতে থাক।" (ইবনু কাসীর)

স্ত্রীর সাথে মিলনের সময়েও 'বিসমিল্লাহ' বলা উচিত। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে মিলনের ইচ্ছে করলে সে যেন 'বিসমিল্লা-হ' পাঠ করে (নিম্নবর্ণিতভাবে)।"

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

অর্থাৎ "আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং যা আমাদেরকে দান করবেন তাকেও শয়তানের হাত হতে রক্ষা করুন।"
(বুখারী, মুসলিম)

জাহিলীয়াতের যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ দেব-দেবীদের নামে শুরু করতো। এ প্রথা থেকে বিরত থাকার জন্য জিব্রীল ('আঃ) কুরআনের যে আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাতে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যথা اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ, পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে।

কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে প্রথমে প্রত্যেক কাজ با سمك اللهم (বিইসমিকা আল্লাহুম্মা) বলে শুরু করতেন এবং কোন কিছু লিখতে হলে এ দু'আ লিখতেন। কিন্তু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম) আয়াত নাযিল হওয়ার পরে সব সময়ের এবং সব ক্ষেত্রের জন্যে এটা লিখার নিয়ম চালু হয়েছে। (কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ্ বলবে, বাতি নেভাতেও 'বিসমিল্লা-হ' বলবে, পাত্র ঢাকতে 'বিসমিল্লা-হ' বলবে; খাবার খেতে, পানি পান করতে, অযূ করতে, সওয়ারীতে (যানবহনে) উঠতে এবং তা থেকে নামতে 'বিসমিল্লা-হ' বলার নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। (কুরতুবী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে কিছু দান করার পর যদি সে তার জন্যে 'আলহাম্দু লিল্লাহ' পাঠ করে তবে তার প্রদত্ত বস্তুই গৃহীত বস্তু হতে উত্তম।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন ঃ "যদি আল্লাহ আমার উম্মাতের মধ্যে কোন লোককে দুনিয়া দান করেন এবং সে যদি তার জন্য 'আলহাম্‌দু লিল্লাহ' পাঠ করে তবে এ কথাটি সমস্ত দুনিয়া হতে উত্তম।" (ইবনু কাসীর)

এর মর্মার্থ এই যে, 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বলার তাওফীক লাভ যত বড় নি'আমাত, সারা দুনিয়া দান করাও ততো বড় নি'আমাত নয়। কেননা দুনিয়া তো ধ্বংসশীল, কিন্তু এ কথার সাওয়াব চিরস্থায়ী। (কুরতুবী)

একটি দুর্বল হাদীস থেকে জানা যায়, 'উমার ফারূক (রাঃ)-এর খিলাফাত কালে এক বছর ফড়িং দেখা যায়নি। এমনকি অনেক অনুসন্ধান করেও ফড়িং পাওয়া যায়নি। তিনি এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সিরিয়া ও ইরাকে অশ্বারোহী (সৈন্য) পাঠিয়ে দিলেন ফড়িং খোঁজার জন্য, কোন স্থানে ফড়িং দেখা যায় কি না। ইয়ামান যাত্রী অল্প কিছু ফড়িং ধরে এনে আমীরুল মু'মিনীনের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি তা দেখে তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) উচ্চারণ করলেন এবং বললেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি ঃ "আল্লাহ তা'আলা এক হাজার জাতি সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে ছয়শো পানিতে, চারশো স্থলে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে জাতি ধ্বংস হবে তা হবে ফড়িং। অতঃপর একে একে সব জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে যেমনভাবে তাসবীহের সূতার বাঁধন ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একে একে ঝরে পড়ে। (ইবনু কাসীর)

আরবী ভাষায় رَبّ (রাব) শব্দের অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা। লালন-পালন বলতে যা বুঝায় তা হল কোন বস্তুকে তার সমস্ত 'আমালের প্রতি লক্ষ্য করে পর্যায়ক্রমে সামনে এগিয়ে নিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়া।

এ (রাব) শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট। সম্বন্ধপদরূপে অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা প্রত্যেকটি জীব বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

"রাব" শব্দটির মধ্যে ভয় প্রদর্শন রয়েছে এবং "রাহমান" ও "রাহীম" শব্দ দু'টির মধ্যে আশা ভরসা রয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যদি ঈমানদারগণ আল্লাহর ক্রোধ (রাগ) এবং তাঁর ভীষণ শাস্তি

সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানতো তবে তাদের অন্তর হতে বেহেশ্‌ত পাবার লোভ-লালসা সরে যেতো এবং কাফিরেরা যদি আল্লাহ তা'আলার দান ও দয়া সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখতো তবে তারা কখনও নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতো না। (মুসলিম)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন' অর্থাৎ তিনি সেদিনের মালিক বা বাদশাহ যেদিন তাঁর রাজত্বে তিনি ছাড়া আর কেউ থাকবে না, যেমন দুনিয়ার বুকে রূপক অর্থে ছিল।" يَوْمِ الدِّيْنِ-এর মর্মার্থ হলো সমগ্র সৃষ্ট জীবের হিসাব দেয়ার দিন অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন, যেদিন সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের ন্যায্য ও চুলচেড়া প্রতিদান দেয়া হবে। হ্যাঁ, তবে যদি মহান আল্লাহ কোন কাজ নিজ গুণে ক্ষমা করেন তবে তা হবে তাঁর ইচ্ছা ভিত্তিক। (ইবনু কাসীর)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর একটি মারফূ' হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "ঐ ব্যক্তির নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট যাকে শাহান শাহ বা রাজাধিরাজ- বাদশাহর বাদশা বলা হয়। কারণ সবকিছুরই প্রকৃত মালিক আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই (বাদশাহর বাদশা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা)।"

সহীহ হাদীসের মধ্যে এসেছে, "আল্লাহ তা'আলা সেদিন সমগ্র যমীনকে নিজ মুষ্টির ভিতর গ্রহণ করবেন এবং আকাশ তাঁর ডান হাতে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে জড়িয়ে থাকবে। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ "আমি আজ প্রকৃত বাদশাহ, যমীনের সে প্রতাপশালী বাদশাহরা কোথায় গেল? কোথায় রয়েছে সে অহংকারীগণ?"

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেন ঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۞

অর্থাৎ "আজ রাজত্ব কার? শুধুমাত্র এক আল্লাহরই" আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শুধু রূপক অর্থে মালিক বলা হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۞

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তালূতকে তোমাদের জন্যে মালিক বা বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন।" (সূরা বাক্বারাহ ২৪৭)

এখানে তালূতকে মালিক বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদে একটি আয়াত আছে ঃ

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاۤءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا۞

অর্থাৎ "তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী করেছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ (মালিক) বানিয়েছেন।" **(সূরা আল-মায়িদাহ ২০)**

সে একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যপ্ত; অর্থাৎ প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। ঐ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানা তুলনাযোগ্য নয়। কেননা মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চতুঃসীমায় সীমাবদ্ধ। এক সময় তা ছিল না; আবার কিছুদিন পরেই তা থাকবে না।

যদিও দুনিয়াতে প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ তা'আলারই, কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানব জাতিকেও দান করেছেন এবং পার্থিব জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর এবং আসবাবপত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এ কথা ঘোষণা করে অহংকারী ও নির্বোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণস্থায়ী। এমন দিন অতি সত্বরই আসবে, যেদিন কেউই জাহিরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক ও একক সত্তার হয়ে যাবে।

সে একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সমতুল্য হবে। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ, আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর প্রতি পোষণকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমতুল্য হবে না। আবার কারো উপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য ও খিদমাত করা, কারো কাজকে আল্লাহ্র ইবাদাতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য

কারো নামে মানৎ করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সামনে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের আবেগ-আকুতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা। যথা– রুকূ' বা সিজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ নয় বা করা যাবে না।

"আমরা আপনার ছাড়া আর কারও 'ইবাদাত করি না এবং আপনার ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর করি না।" এটাই হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস।

এখানে সে মালিককে সম্বোধন করে স্বীয় দীনতা, হীনতা ও দরিদ্রতা প্রকাশ করলো এবং বলতে লাগলো ঃ "হে আল্লাহ! আমরা তো আপনার হীন ও দুর্বল দাস মাত্র এবং আমরা সর্বকার্যে, সর্বাবস্থায় ও সাধনায় একমাত্র আপনারই মুখাপেক্ষী।"

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আপনি ছাড়া আর কারও আমরা 'ইবাদাত করি না, কাউকে ভয়ও করি না এবং কারও উপর আশাও রাখি না।" আর وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর মর্মার্থ হচ্ছে ঃ "আমরা আপনার পূর্ণ আনুগত্য করি ও আমাদের সকল কার্যে একমাত্র আপনারই কাছে সহায়তা প্রার্থনা করি।" (ইবনু কাসীর)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত না করার শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করবে না।

বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে সব সময়ই নিয়ে থাকে। এছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চলতে পারে না।

সাহায্য প্রার্থনার যে কৌশল কাফিররা গ্রহণ করে থাকে, কুরআন তাকে বাতিল ও শির্‌ক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে- কোন ফেরেশতা, নাবী, ওয়ালী বা দেব-দেবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ্ তা'আলাই, তবে তিনি তাঁর কুদরাতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কুরআনে إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাইতে পারি না।

নাবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে; যথা- মু'জিযা।

বাদ্‌রের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুসৈন্যদের প্রতি এক মুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে কঙ্কর সকল শত্রুসৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল। সে মু'জিযা সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "হে মুহাম্মাদ ﷺ! এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন।" এতে বুঝা যায় যে, নাবীগণের মাধ্যমে মু'জিযারূপে যেসব অস্বাভাবিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহ্‌রই কাজ। অনুরূপ নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতি বলেছিল, আপনি যদি সত্য নাবী হয়ে থাকেন, তবে যে শক্তি সম্পর্কে আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ মু'জিযারূপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে আসবে। তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না।

সূরা ইব্‌রাহীমে নাবী ও রাসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ يَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۞

অর্থাৎ, "কোন মু'জিযা দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না" তাই কোন নাবী বা অলী কোন মু'জিযা বা কারামাত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এরূপ ক্ষমতা কাউকেই দেয়া হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য নাবীগণকে মুশরিকরা কত রকমের মু'জিযা দেখাতে বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে সেগুলো প্রকাশ পেয়েছে।

আমাদেরকে যেন এমন কাজের তাওফীক দেয়া হয় যা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় কাজ এবং যার উপর 'আমাল করলে আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাকে পুরস্কৃত করেন। এটাই সীরাতে মুসতাকীম। (ইবনু জারীর)

এখন যদি প্রশ্ন করা যায় যে, মু'মিনের তো পূর্বেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভ হয়ে গেছে, সুতরাং নামাযে বা বাইরে হিদায়াত চাওয়ার আর

প্রয়োজন কি? এর উত্তরে বলা হবে, এখানে হিদায়াত চাওয়ার অর্থ হলো হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাওয়া। কারণ বান্দা প্রত্যেক মুহূর্তে ও সর্বাবস্থায় প্রতিনিয়তই আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী। সে নিজে তার জীবনের লাভ-ক্ষতির মালিক নয়। বরং সে প্রতিদিন আল্লাহরই নিকট প্রত্যাশী ও মুখাপেক্ষী। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শিখিয়েছেন যে, সে যেন সব সময় হিদায়াত প্রার্থনা করে এবং তার উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাইতে থাকে। ভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাঁর দরজায় ভিক্ষুক করে নিয়েছেন। সে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেয়। তার প্রার্থনা ক্বূল করেন। বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায় ও মুহতাজ ব্যক্তি যখন দিন-রাত আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ তখন তার সে আকুল প্রার্থনা ক্বূলের জিম্মাদার হয়ে যান। (ইবনু কাসীর)

ইয়াহূদীদের 'আমাল নেই এবং খ্রিষ্টানদের জ্ঞান নেই। এজন্যেই ইয়াহূদীরা অভিশপ্ত হলো এবং খ্রিষ্টানেরা হলো পথভ্রষ্ট। কেননা জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে 'আমাল পরিত্যাগ করা লা'নাত বা অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খ্রিষ্টানেরা যদিও একটা জিনিসের ইচ্ছে করে, কিন্তু সঠিক পথ তারা পায় না। কেননা তাদের কর্মপন্থা ভুল এবং তারা সত্যের অনুসরণ হতে দূরে সরে পড়েছে। অভিশাপ ও পথভ্রষ্টতা এ দুই দলের তো রয়েছেই কিন্তু ইয়াহূদীরা অভিশাপের অংশে একধাপ এগিয়ে রয়েছে।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ع ۞

অর্থাৎ, "এরা পূর্ব হতে পথভ্রষ্ট এবং অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে এবং তারা সোজা পথ হতে ভ্রষ্ট রয়েছে।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৭৭)

এ কথার সমর্থনে বহু হাদীস ও বর্ণনা পেশ করা যেতে পারে। 'আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেনাবাহিনী একদা আমার ফুফুকে এবং কতকগুলো লোককে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এনে হাজির করেন। আমার ফুফু তখন বলেন ঃ "আমাকে দেখা-শোনা করার লোক দূরে সরে

রয়েছে এবং আমি একজন অধিক বয়স্কা অচলা বৃদ্ধা। আমি কোন খিদমাতের যোগ্য নই। সুতরাং দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আল্লাহ আপনার উপরও দয়া করবেন।" রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "যে তোমার খবরাখবর নিয়ে থাকে, সে ব্যক্তিটি কে?" তিনি বললেন ঃ "আদী ইবনু হাতিম।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "সে কি ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ হতে এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দিয়ে দেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে আর একটি লোক ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি 'আলী (রাঃ)-ই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সওয়ারীর প্রার্থনা কর।" আমার ফুফু তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালে সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর হয় এবং তিনি সুয়ারী পেয়ে যান। তিনি এখান হতে মুক্তিলাভ করে সোজা আমার নিকট চলে আসেন এবং বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানশীলতা তোমার পিতা হাতিমকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর কাছে একবার কেউ গেলে আর শূন্য হাতে ফিরে আসে না।" এ কথা শুনে আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হই। আমি দেখি যে, ছোট ছেলে ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে অবাধে যাতায়াত করছে এবং তিনি তাদের সাথে সহৃদয়ভাবে আলোচনা করছেন। এ দেখে আমার বিশ্বাস হলো যে, তিনি কাইসার ও কিসরার মত বিশাল রাজত্ব ও সম্মানের অভিলাষী নন। তিনি আমাকে দেখে বলেন ঃ 'আদী! لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলা হতে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য আছে কি? اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা হতে এখন তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? মহাসম্মানিত আল্লাহ তা'আলা থেকে বড় আর কেউ আছে কি? "(তাঁর এ কথাগুলো এবং তাঁর সরলতা আমার উপর এমনভাবে দাগ কাটলো যে) আমি তৎক্ষণাৎ কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলাম। তাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং বলেন مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা ইয়াহূদীকে বুঝানো হয়েছে এবং ضَالِّيْنَ দ্বারা খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। (মুসনাদ আহমাদ)

আর একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, 'আদী (রাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ তাফসীরই করেছিলেন। এ হাদীসের অনেক সনদ আছে এবং বিভিন্ন শব্দে সে সব বর্ণিত হয়েছে।

সরল পথ কোন্‌টি? "সোজা সরল রাস্তা" সে পথকে বলে যার কোন মোড় বা ঘোরপ্যাঁচ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে ইফরাত বা তাফরীত এর-অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা এবং তাফরীত অর্থ মর্জিমত কাট-ছাট করে নেয়া। ইরশাদ হয়েছে ঃ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞

অর্থাৎ, যে সব লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ বলতে ঐ সকল লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের হুকুম-আহ্‌কামকে বুঝে-জানে, তবে ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। যেমন– সাধারণভাবে ইয়াহূদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দ্বীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা নাবী-রাসূলগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না। ضَآلِّيْنَ তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমালঙ্ঘন করে অতিরঞ্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে। যথা- নাসারাগণ। তারা নাবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানের নামে এমন বাড়াবাড়ি করেছে যে, নাবীদেরকে আল্লাহর স্থানে উন্নীত করে দিয়েছে। ইয়াহূদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র নাবীদের কথা মানেনি; এমনকি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। অপরদিকে নাসারাদের বেলায় অতিরঞ্জন হচ্ছে এই যে, তারা নাবীদেরকে আল্লাহ্‌র পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

ইতিহাসের পুস্তকসমূহে বর্ণিত আছে যে, যাইদ ইবনু 'আম্‌র ইবনু নুফাইল যখন খাঁটি ধর্মের অনুসন্ধানে স্বীয় বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গী-সাথীসহ বেরিয়ে পড়লেন এবং এদিক ওদিক বিচরণ শেষে সিরিয়ায় আসলেন, তখন ইয়াহূদীরা তাঁদেরকে বললো ঃ "আল্লাহর অভিশাপের কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মে আসতেই পারবেন না।" তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ "তা হতে বাঁচার উদ্দেশেই তো আমরা সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে বের হয়েছি, কাজেই কিরূপে তা গ্রহণ করতে পারি?" তাঁরা খ্রিস্টানদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা বললো ঃ "আল্লাহ তা'আলার লা'নাত ও অসন্তুষ্টির কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মেও আসতে পারবেন

না।” তাঁরা বললেন ঃ “আমরা এটাও করতে পারি না।” তারপর যাইদ ইবনু ‘আম্‌র ইবনু নুফাইল স্বাভাবিক ধর্মের উপরই রয়ে গেলেন। কেননা ইয়াহূদীদের ধর্মের সাথে এর অনেকটা মিল ছিল। যাইদের ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অরাকা ইবনু নাওফিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবূওয়াতের যুগ পেয়েছিলেন এবং আল্লাহর হিদায়াত তাঁকে সুপথ প্রদর্শন করেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমান এনেছিলেন এবং সে সময় পর্যন্ত যে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। **(ইবনু কাসীর)**

সূরা ফাতিহা শেষ করে ‘আমীন’ বলা মুস্‌তাহাব। ‘আমীন’ এর অর্থ হচ্ছে ঃ “হে আল্লাহ! আপনি কবূল করুন।”

ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়ে ‘আমীন’ বলতে শুনেছি। তিনি স্বর দীর্ঘ করতেন। **(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী)**

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ “নামাযে ‘আমীন’ বলা এবং প্রার্থনায় ‘আমীন’ বলা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আমার প্রতি একটি বিশেষ দান, যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে দান করা হয়নি। হ্যাঁ, তবে এটুকু বর্ণিত আছে যে, মূসা (আঃ)-এর বিশেষ প্রার্থনার উপর হারূন (আঃ) ‘আমীন’ বলতেন। তোমরা তোমাদের প্রার্থনা আমীনের উপর শেষ কর। তাহলে তোমাদের পক্ষেও আল্লাহ তা কবূল করবেন।” এ হাদীসটিকে সামনে রেখে কুরআন মাজীদের ঐ শব্দগুলো লক্ষ্য করুন যা মূসা (আঃ)-এর প্রার্থনায় বলা হয়েছে।

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۞

অর্থাৎ “এবং মূসা বললো– হে আমাদের প্রভু! আপনি ফির‘আওনকে ও তার সভাসদবর্গকে ইহলৌকিক জীবনে সৌন্দর্য ও সম্পদ দান করেছেন যার ফলে সে

অন্যদেরকে আপনার পথ হতে সরিয়ে নিয়ে বিপথে চালিত করছে; হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদের ধন-মাল ধ্বংস করুন এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিন, কারণ তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান আনবে না।"

(সূরা ইউনুস ৮৮)

মূসা (আঃ)-এর দু'আ ক্ববূলের ঘোষণা নিম্নের এসব শব্দ দ্বারা করা হচ্ছে ঃ

قَالَ قَدْ أُجِيْبَتْ دَّعْوَ تُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

অর্থাৎ "তিনি বললেন– তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং মূর্খদের পথে যেয়ো না। (সূরা ইউনুস ৮৯)

[ইবনু কাসীর]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ। বলার পর 'আমীন' বলেন এবং যমীনবাসীদের আমীনের সাথে আসমানবাসীদের 'আমীন' বলার শব্দও মিলিত হয়, তখন আল্লাহ বান্দার পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন। 'আমীন' বলার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন, এক ব্যক্তি এক গোত্রের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করলো ও জয়লাভ করলো। অতঃপর যুদ্ধলব্ধ মাল জমা করলো। এখন সে অংশ নেয়ার জন্যে নির্বাচনের গুটিকে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু তার নাম বেরই হলো না এবং সে কোন অংশও পেলো না। এতে সে বিস্মিত হয়ে বললো– এ কেন হবে? তখন সে উত্তর পেলো, তোমার 'আমীন' না বলার কারণে। (ইবনু কাসীর)

[সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর সমাপ্ত]

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ط (٢) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ط (٣) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ع ۞

সূরা আল-কাওসার (মাক্কী)

(আয়াত–৩, রুকূ'–১)

পরম দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত-১ ঃ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার নামক হাউজ দান করেছি। আয়াত-২ ঃ অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। আয়াত-৩ ঃ নিশ্চয়ই আপনার দুশমনই নাম- চিহ্নবিহীন নির্বংশ।

সূরা আল-কাওসার-এর তাফসীর ঃ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে হাসি মুখে তিনি বললেন অথবা তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন ঃ "এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।" তারপর তিনি 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম' পড়ে সূরা কাওসার পাঠ করলেন। তারপর তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কাওসার কি তা কি তোমরা জান?" উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তার রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই ভাল জানেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন ঃ "কাওসার হলো একটা জান্নাতী নহর। তাতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এটা দান করেছেন। কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাত সে কাওসারের ধারে সমবেত হবে। আসমানে

যতো নক্ষত্র রয়েছে সেই কাউসারে পিয়ালার সংখ্যাও ততো। কিছু লোককে কাওসার থেকে সরিয়ে দেয়া হবে তখন আমি বলবো ঃ হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার উম্মাত।" তখন তিনি আমাকে বলবেন ঃ "তুমি জান না, তোমার (ইন্তিকালের) পর তারা কত রকম বিদ'আত আবিষ্কার করেছে।"

(মুসনাদ, আহমাদ)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, কাওসার হলো জান্নাতের একটি নহর যার উভয় তীর স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। ইয়াকূত ও মণি-মুক্তার উপর ওর পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ঐ কাওসারের পানি বরফের চেয়েও অধিক সাদা এবং মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি। **(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)**

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযাহ্ (রাঃ)-এর বাড়িতে আগমন করেন। হামযা (রাঃ) ঐ সময় বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বানূ নাজ্জার গোত্রীয় মহিলা বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন ঃ "আমার স্বামী এই মাত্র আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে রাওয়ানা হয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি বানূ নাজ্জারের ওখানে আটকা পড়ে গেছেন। আপনি এসে বসুন।" অতঃপর হামযাহ্ (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে মালীদা (এক প্রকার খাদ্য) পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আহার করলেন। হামযাহ্ (রাঃ) এর স্ত্রী আনন্দের সুরে বললেন ঃ "আপনি নিজেই আমাদের গরীব খানায় আগমন করেছেন এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমি তো ভেবেছিলাম যে, আপনার দরবারে হাযির হয়ে আপনাকে হাউযে কাওসার প্রাপ্তি উপলক্ষে মুবারকবাদ জানাবো। এই মাত্র আবূ 'আম্মারাহ (রাঃ) আমার কাছে এ সুসংবাদ পৌছিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন ঃ "হ্যাঁ, সে হাউযে কাওসারের মাটি হলো ইয়াকূত, পদ্মরাগ, পান্না এবংমণি-মুক্তা।

(ইবনু জারীর)

এখানে উট বা অন্য পশু কুরবানীর কথা বলা হয়েছে। মুশরিকরা সিজদাহ্ এবং কুরবানী আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের নামে করতো। এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই 'ইবাদাত করো। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۝

"যে পশু যবেহ কর আল্লাহর নাম নেয়া হয় না তা তোমরা খেয়ো না, কেননা এটা ফিস্‌ক বা অন্যায় আচরণ।" **(সূরা আল-আন'আম ১২১)**

نحر এর অর্থ কুরবানীর পশু যবেহ করা এ উক্তিটিই হলো সঠিক উক্তি এজন্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের নামায শেষ করার পরপরই নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করতেন এবং বলতেন ঃ "যে আমাদের নামাযের মত নামায পড়েছে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী করেছে সে শারী'আত সম্মতভাবে কুরবানী করেছে আর যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বেই কুরবানী করেছে তার কুরবানী আদায় হয়নি।" **(ইবনু কাসীর)**

আতা' (রাহঃ) বলেন যে, এ আয়াত আবূ লাহাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানের ইন্তিকালের পর এ দুর্ভাগা দুর্বৃত্ত মুশরিকদেরকে বলতে লাগলো "আজ রাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধারা বিলোপ করা হয়েছে।" আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এটাও বলেছেন যে, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত শত্রুকেই বুঝানো হয়েছে। যাদের নাম নেয়া হয়েছে এবং যাদের নাম নেয়া হয়নি তাদের সকলকেই বুঝানো হয়েছে।

আরবে এ প্রচলন রয়েছে যে, যখন কারো একমাত্র পুত্র সন্তান মারা যায় তখন তাকে 'আবতার' বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানদের ইন্তিকালের পর শত্রুতার কারণে তারা তাঁকে 'আবতার' বলছিল। আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। 'আবতার' এর অর্থ দাঁড়ালো ঃ যার মৃত্যুর পর তার সম্পর্কিত আলোচনা, নাম নিশানা মুছে যায়। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্কেও ধারণা করেছিল যে, সন্তান বেঁচে থাকলে তাঁর আলোচনা জাগরুক থাকতো। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। অথচ তারা জানে না যে, পৃথিবী টিকে থাকা অবধি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাম টিকিয়ে রাখবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শারী'আত চিরকাল বাকি থাকবে। তাঁর আনুগত্য সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে অত্যাবশ্যক ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর প্রিয় ও পবিত্র নাম সকল মুসলিমের মনে ও মুখে রয়েছে। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর নাম আকাশতলে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান

থাকবে। জলে-স্থলে সর্বদা তাঁর নাম আলোকিত হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ এবং তাঁর আল ও আসহাবের প্রতি দরূদ ও সালাম সর্বাধিক পরিমাণে প্রেরণ করুন! আমীন! (ইবনু কাসীর)

সূরা আল-কাফিরূন, সূরা আন্-নাস্‌র, সূরা লাহাব ও সূরা আল-ইখলাস-এর তাফসীর ঃ

এ সকল সূরার শানে নুযূল এই যে, কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললো ঃ "এক বছর আপনি আমাদের মা'বূদ প্রতিমাগুলোর 'ইবাদাত করুন, পরবর্তী বছর আমরাও এক আল্লাহর 'ইবাদাত করবো।" তাদের এ প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ সূরা নাযিল করেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ-কে আদেশ করেছেন ঃ তুমি বলে দাও, হে কাফিরগণ! না আমি তোমাদের মা'বূদের 'ইবাদাত করি, না তোমরা আমার মা'বূদের 'ইবাদাত কর। আর না আমি তোমাদের মা'বূদের 'ইবাদাত করবো, আর না তোমরা আমার মা'বূদের উপাসনা করবে। অর্থাৎ আমি শুধু আমার মা'বূদের পছন্দনীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁরই উপাসনা করব, তোমাদের পদ্ধতি তো তোমরা নির্ধারণ করে নিয়েছো। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন কাফিরদেরকে জানিয়ে দেন ঃ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্যে আমার দ্বীন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ج اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞

"হে রাসূল ﷺ! যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার 'আমাল আমার জন্যে এবং তোমাদের 'আমাল তোমাদের জন্যে, আমি যে 'আমাল করি তা হতে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যে 'আমাল কর তা হতে আমিও মুক্ত।" (সূরা আল-ইউনুস ৪১)

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ (٢) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ (٣) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ج (٤) وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ (٥) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ط (٦) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ع ۞

সূরা আল কাফিরূন (মাক্কী)

(আয়াত–৬, রুকূ'–১)

পরম দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত-১ ঃ আপনি বলে দিন ঃ হে কাফিরবৃন্দ! আয়াত-২ ঃ আমি তার 'ইবাদাত করি না, তোমরা যার 'ইবাদাত কর। আয়াত-৩ ঃ এবং তোমরাও তার 'ইবাদাতকারী নও যার 'ইবাদাত আমি করি। আয়াত-৪ ঃ আর আমিও তার 'ইবাদতকারী নই, যার 'ইবাদাত তোমরা কর। আয়াত-৫ ঃ এবং তোমরাও তার 'ইবাদাতকারী নও, যার 'ইবাদাত আমি করি। আয়াত-৬ ঃ তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল।

সূরা আল-কাফিরূন-এর তাফসীর ঃ

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফের পর দুই রাক'আত নামাযে এ সূরা এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরা পাঠ করতেন। (মুসলিম)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামাযেও এ সূরা দু'টি পাঠ করতেন। (মুসলিম)

ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক মাস ধরে ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত নামাযে এবং মাগরিবের পরের দুই রাক'আত নামাযে قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَفِرُونَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এ সূরা দু'টি পাঠ করতে দেখেছেন। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী)

জিবিল্লাহ ইবনু হারিসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَفِرُونَ সূরাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। কেননা এটা হলো শির্ক হতে মুক্তি লাভের উপায়। (তাবারানী)

হারিস ইবনু জিবিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি ঘুমোবার সময় পাঠ করবো।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "যখন তুমি বিছানায় ঘুমোতে যাবে, তখন قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَفِرُونَ সূরাটি পাঠ করবে। কেননা এটা শির্ক হতে মুক্তি লাভের উপায়।" (আহমাদ)

জুবাইর ইবনু মুত'ইম (রাঃ) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশী হোক? আমি জবাব দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেন ঃ কুরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা-সূরা কাফিরূন, নাস্র, ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা 'বিস্মিল্লা-হ্' বলে শুরু কর ও 'বিস্মিল্লা-হ্' বলে শেষ কর। জুবাইর (রাঃ) বলেন, ইতোপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। 'আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন। (মাযহারী)

لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ -এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হওয়ায় স্বভাবতঃ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্যে বুখারী (রাহঃ) অনেক তাফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমানকালের জন্যে এবং একবার ভবিষ্যৎকালের জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি এক্ষণে কার্যতঃ তোমাদের উপাস্যদের 'ইবাদাত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের 'ইবাদাত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না।

سُوْرَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ (٢) وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ (٣) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ع ⊛

সূরা আন্-নাস্র (মাদানী)

(আয়াত–৩, রুকূ'–১)

পরম দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত-১ ঃ যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে, **আয়াত-২ ঃ** এবং আপনি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, **আয়াত-৩ ঃ** তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করতে থাকুন এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। বস্তুতঃ তিনি তো অতিশয় তাওবাহ্ কুবূলকারী।

সূরা আন্-নাস্র-এর তাফসীর ঃ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্বাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন "সর্বশেষ কোন্ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে তা কি তুমি জান?" উত্তরে তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, সূরা ইযাজাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত্হু' সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে।" ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন ঃ "তুমি সত্য বলেছ।" (নাসায়ী)

ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আইয়্যামে তাশরীকের (১১ই, ১২ই ও ১৩ই যিলহাজ্জের তারিখে) মধ্যভাগে اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, এটা বিদায়ী সূরা। সুতরাং তখনই তিনি সাওয়ারী তৈরি করার নির্দেশ দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। তারপর তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ খুত্বাহ্ প্রদান করলেন। **(বাযযার)**

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরা অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমাহ্ (রাঃ)-কে ডেকে বলেন ঃ "আমার পরলোক গমনের খবর এসে গেছে।" এ কথা শুনে ফাতিমাহ্ (রাঃ) কাঁদতে শুরু করলেন।

তারপরই তিনি হাসতে লাগলেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ "আমার আব্বার পরলোক গমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার খবর শুনে আমার কান্না এসেছিল। কিন্তু আমার কান্নার সময় তিনি আমাকে বললেন ঃ "তুমি ধৈর্য ধারণ করো। আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। **(বাইহাক্বী)**

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "বাদ্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক মুজাহিদদের সাথে 'উমার (রাঃ) আমাকেও শামিল করে নিতেন। এ কারণে কারো কারো মনে সম্ভবতঃ অসন্তুষ্টির ভাব সৃষ্টি হয়ে থাকবে। একদা তাদের মধ্যে একজন আমার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন ঃ সে যেন আমাদের সাথে না থাকে। তার সমবয়সী ছেলে আমাদেরও তো রয়েছে।" তাঁর এ মন্তব্য শুনে 'উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ তোমরা তো তাকে খুব ভালরূপেই জান!" একদিন তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং আমাকেও স্মরণ করলেন আমি বুঝতে পারলাম যে, আজ তিনি তাঁদেরকে কিছু দেখাতে চান। আমরা সবাই হাযির হলে তিনি সকলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরাটি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি (অর্থাৎ এ সূরাটি কিসের ইঙ্গিত বহন করছে)।" কেউ কেউ বললেন ঃ "এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার গুণগান করার জন্যে এবং তাঁর নিকট

ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যে আমাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এলে এবং আমাদের বিজয় সূচিত হলেই যেন আমরা এরূপ করি।" কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন, কিছুই বললেন না। 'উমার (রাঃ) তখন আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার মতামতও কি এদের মতই?" আমি উত্তরে বললাম ঃ না, বরং আমি এ বুঝেছি এ সূরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরলোক গমনের ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁকে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর ইহলৌকিক জীবন শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং তিনি যেন তাঁর প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ কথা শুনে 'উমার (রাঃ) বললেন ঃ "আমিও এটাই বুঝেছি।" (বুখারী)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সূরা নাস্‌র কুরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ, এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রিওয়ায়াতে কোন কোন আয়াত নাযিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থী নয়। সূরা ফাতিহাকে এ অর্থেই কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরারূপে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। সুতরাং সূরা 'আলাক্ব, মুদ্দাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাযিল হলে তা এর পরিপন্থী নয়।

মাক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রিসালাত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। মক্কা বিজয় তাদের সে বাধা দূর করে দেয়। সে মতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়ামান থেকে সাতশ' ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথের মধ্যে আযান দিতে দিতে ও কুরআন পাঠ করতে করতে মাদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যেহেতু এ সূরাটিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরলোক গমনের সংবাদ ছিল সেহেতু সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আখিরাতের কাজে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগী হন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে এবং ইয়ামানবাসী এসে পড়েছে।" তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ!

ইয়ামানবাসীরা কি (প্রকৃতির লোক?)" উত্তরে তিনি বললেন ঃ "তাদের অন্তর কোমল, স্বভাব নম্র এবং তারা ঈমান ও বুদ্ধি মত্তার অধিকারী।" (তাবারানী)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে রাসূল ﷺ! যে মক্কা থেকে কাফিররা তোমাকে চলে যেতে বাধ্য করেছে, সে মাক্কা বিজয় যখন তুমি স্বচক্ষে দেখবে, নিজের পরিশ্রমের ফল যখন দেখতে পাবে, আরো যখন দেখতে পাবে যে, জনগণ আল্লাহর ধর্মে দলে দলে প্রবেশ করছে তখন তুমি স্বীয় প্রতিপালকের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তুমি পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকো। মনে রেখো যে, তোমার ইহকালীন দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং এখন পরকালের প্রতি মনোযোগী হও। সেখানে তোমার জন্যে বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। তোমার মেহমানদারী স্বয়ং আমিই করবো। কাজেই আমার রাহমাত ও কুদরাতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে অধিক পরিমাণে আমার প্রশংসা করো, তাওবাহ্-ইসতিগফার করো, নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাহ্ ক্ববুল করে থাকেন। (ইবনু কাসীর)

সহীহুল বুখারীতে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকূ ও সিজদাহ্তে নিম্নলিখিত তাসবীহ্ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ.

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি মহাপবিত্র এবং আপনার জন্যে সমস্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন।" রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন মাজীদের .... فسبح এ আয়াতের উপর অধিক পরিমাণে 'আমাল করতেন।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শেষ জীবনে নিম্নলিখিত কালিমাগুলো অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

অর্থাৎ "আল্লাহ মহাপবিত্র, তাঁর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট তাওবাহ্ করছি।"

উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এবং আসতে যেতে নিম্নের তাসবীহ পড়তে থাকতেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থাৎ "আল্লাহ মহাপবিত্র এবং তাঁর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।"

উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ "আমি একবার এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা নাস্র তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।" (ইবনু জারীর)

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ﷺ-কে মহাবিজয় দান করলেন তখন এরা সবাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। এরপর দু'বছর যেতে না যেতেই সমগ্র আরব ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। প্রত্যেক গোত্রের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহর এক প্রতিবেশী সফর থেকে ফিরে আসার পর জাবির (রাঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সে প্রতিবেশী মুসলিমদের মধ্যে ভেদাভেদ, দন্দ্ব-কলহ এবং নতুন নতুন বিদ'আতের কথা ব্যক্ত করলে জাবির (রাঃ)-এর চোখ দু'টি অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ "আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই তারা দলে দলে এ দ্বীন থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে।" (মুসনাদ আহ্মাদ)

سُوْرَةُ اللَّهَبِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ط (٢) مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ط (٣) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ج (٤) وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ج (٥) فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ع ۝

সূরা আল-লাহাব (মাক্কী)

(আয়াত–৫, রুকূ'–১)

পরম দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত-১ ঃ ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হাত দু'টি এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। আয়াত-২ ঃ তার মাল-দৌলত এবং সে যা উপার্জন করেছে তার কোন কাজে আসেনি। আয়াত-৩ ঃ শীঘ্রই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে, আয়াত-৪ ঃ এবং তার স্ত্রীও যে কাঠের বোঝা বহন করে। আয়াত-৫ ঃ তার গলায় থাকবে উত্তমরূপে পাকানো একটি রশি।

সূরা আল-লাহাব-এর তাফসীর ঃ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাতহা' নামক স্থানে গিয়ে একটি পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে "ইয়া সাবা'হা'হ্, ইয়া সাবা'হা'হ্" (অর্থাৎ হে ভোরের বিপদ, হে ভোরের বিপদ) বলে ডাক দিতে শুরু করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কুরাইশ নেতা সমবেত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন ঃ "যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, সকালে অথবা সন্ধ্যাবেলায় শত্রুরা

তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই সমস্বরে বলে উঠলো ঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করবো।" তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ "শোনো, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি আগমনের সংবাদ দিচ্ছি।" আবূ লাহাব তার এ কথা শুনে বললো ঃ "তোমার সর্বনাশ হোক, এ কথা বলার জন্যেই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছো? তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন।" (বুখারী)

রাবী'আহ্ ইবনু 'ইবাদ দাইলী (রাঃ) তার ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ইসলাম পূর্ব যুগের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যুল মাজায এর বাজারে দেখেছি, সে সময় তিনি বলছিলেন ঃ "হে লোক সকল! তোমরা বল ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে।" বহু লোক তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনেই হলুদ বর্ণের ও সবল দেহ-সুস্বাস্থের অধিকারী একটি লোক, যার মাথার চুল দু'পাশে সিঁথি করা, সে এগিয়ে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশে বললো ঃ হে লোক সকল! এ লোক বে-দ্বীন ও মিথ্যাবাদী।" মোট কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সুদর্শন এ লোকটি তাঁর বিরুদ্ধে বলতে বলতে যাচ্ছিল। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বললো ঃ "এ লোকটি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আবূ লাহাব।
(মুসনাদ আহমাদ)

আয়াতে বদদু'আর অর্থে تَبَّتْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আবূ লাহাব ধ্বংস হোক।

মুসলিমদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশে বদ দু'আর বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ আবূ লাহাব যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে تَبًّا لَكَ বলেছিল, তখন মুসলিমদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁরাও ওর জন্যে বদদু'আ করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাঁদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদদু'আর ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবূ লাহাবের ধ্বংস প্রাপ্তির এ পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বাদ্‌র যুদ্ধের সাতদিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জায়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এ অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে তিনদিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ

করেনি। পঁচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।

(বায়ানুল-কুরআন)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন স্বগোত্রকে আল্লাহ্র 'আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন, তখন আবূ লাহাব এ কথাও বলেছিল, আমার এ ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায় তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্র 'আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তার স্বজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানালেন তখন আবূ লাহাব বলতে লাগলো ঃ "যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য হয় তবে আমি ক্বিয়ামাতের দিন আমার ধন-সম্পদ আল্লাহকে ফিদিয়া হিসেবে দিয়ে তাঁর 'আযাব থেকে আত্মরক্ষা করবো।" আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ অতি শীঘ্রই সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও। অর্থাৎ আবূ লাহাব তার স্ত্রীসহ জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে। আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল কুরাইশ নারীদের নেত্রী। তার কুনিয়াত ছিল উম্মু জামীল, নাম ছিল আরওয়া বিনতু হার্ব ইবনু উমাইয়াহ্। সে আবূ সুফ্ইয়ান (রাঃ)-এর বোন ছিল। তার স্বামীর কুফরী, হঠকারিতা এবং ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল সহকারিণী, সহযোগিনী। এ কারণে ক্বিয়ামাতের দিন সেও স্বামীর সঙ্গে আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। (ইবনু কাসীর)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন تَبَّتْ يَدَآ أَبِىْ لَهَبٍ এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। তখন আবূ লাহাবের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বসেছিলেন এবং তাঁর সাথে আবূ বাক্র (রাঃ)ও ছিলেন। আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ঐ যে সে আসছে, আপনাকে

সে কষ্ট দেয় না কি!” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ “তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমাকে দেখতে পাবে না।” অতঃপর আবূ লাহাবের স্ত্রী আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে বললো ঃ “তোমার সাথী (কবিতার ভাষায়) আমার দুর্নাম রটনা করেছে।” আবূ বাক্‌র (রাঃ) তখন কসম করে বললেন ঃ “রাসূলুল্লাহ ﷺ কাব্য চর্চা করতে জানেন না এবং তিনি কবিতা কখনো বলেননি।” দুষ্টা নারী চলে যাওয়ার পর আবূ বাক্‌র (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বললেন ঃ “তার চলে না যাওয়া পর্যন্ত ফেরেশতা আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন।” কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে, উম্মু জামীলের গলায় আগুনের রশি লাগিয়ে দেয়া হবে এবং ঐ রশি ধরে টেনে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর রশি ঢিলে করে তাকে জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে এ শাস্তিই তাকে ক্রমাগত ভাবে দেয়া হবে। (আবূ বাক্‌র বাযযার)

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ج (٢) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ج (٣) لَمْ يَلِدْ لا وَلَمْ يُوْلَدْ لا (٤) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ع ۞

সূরা আল-ইখলাস (মাক্কী)

(আয়াত-৪, রুকূ'-১)

পরম দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত-১ ঃ আপনি বলুন ঃ তিনি আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়, আয়াত-২ ঃ আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী; আয়াত-৩ ঃ তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আয়াত-৪ ঃ আর কেউ তাঁর সমতুল্য নেই।

সূরা আল-ইখলাস-এর তাফসীর ঃ

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুশরিকরা রাসূল ﷺ-কে বললো ঃ "হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আমাদের সামনে তোমার প্রতিপালকের গুণাবলী বর্ণনা কর।" তখন আল্লাহ তা'আলা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ সূরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।" (মুসনাদ আহমাদ)

'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি লোকের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁরা ফিরে এসে নাবী ﷺ-কে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যাঁকে আপনি আমাদের নেতা মনোনীত করেছেন তিনি প্রত্যেক নামাযে কিরাআতের শেষে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি পাঠ করতেন।" রাসূল ﷺ তাঁদেরকে বললেন ঃ "সে কেন এরূপ করতো তা তোমরা তাকে

জিজ্ঞেস কর তো?" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ "এ সূরায় মহান আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, এ কারণে এ সূরা পড়তে আমি খুব ভালবাসি।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন।" (বুখারী)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একজন আনসারী মাসজিদুল কুবার ইমাম ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরই সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তারপর কুরআনের অন্য অংশ পছন্দমত পড়তেন। একদিন মুক্তাদীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আপনি সূরা ইখলাস পাঠ করেন, তারপর অন্য সূরাও এর সাথে মিলিয়ে দেন, কি ব্যাপার? হয় শুধু সূরা ইখলাস পড়ুন অথবা এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরা পড়ুন।" আনসারী জবাব দিলেন ঃ "আমি যেমন করছি তেমনি করবো, তোমাদের ইচ্ছা হলে আমাকে ইমাম হিসেবে রাখো, না হলে বলো, আমি তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিচ্ছি।" মুসল্লীরা দেখলেন যে, এটা মুশকিল ব্যাপার! কারণ উপস্থিত সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন ইমামতির সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁর বিদ্যমানতায় তাঁরা অন্য কারো ইমামতি মেনে নিতে পারলেন না। (সুতরাং তিনিই ইমাম থেকে গেলেন)। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে গমন করলে মুসল্লীরা তাঁর কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তিনি তখন ঐ ইমামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি মুসল্লীদের কথা মানো না কেন? প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ইখলাস পড় কেন?" ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ সূরার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে।" তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ "এ সূরার প্রতি তোমার আসক্তি ও ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে। (বুখারী)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ সূরাটিকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "তোমার এ ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (আহমাদ, তিরমিযী)

আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক অন্য একটি লোককে রাত্রিকালে বারবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ সূরাটি পড়তে শুনে সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। লোকটি সম্ভবতঃ ঐ লোকটির এ সূরা পাঠকে হালকা সাওয়াবের কাজ মনে করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন ঃ "যে সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য। **(বুখারী)**

আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে বললেন ঃ "তোমরা প্রত্যেকেই কি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে না?" সাহাবীদের কাছে এটা খুবই কষ্টসাধ্য মনে হলো। তাই তাঁরা বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের মধ্যে কার এ ক্ষমতা আছে?" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে বললেন ঃ "জেনে রেখো যে, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।" **(বুখারী)**

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে বললেন ঃ তোমরা সমবেত হও, আজ আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শোনাবো।" সাহাবীগণ সমবেত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে এসে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি পাঠ করলেন। তারপর আবার ঘরে চলে গেলেন। সাহাবীরা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন যে, আমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শোনাবেন, সম্ভবত আকাশ থেকে কোন ওয়াহী এসেছে।" এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এসে বললেন ঃ "আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শোনানোর জন্য কথা দিয়েছিলাম। জেনে রেখো যে, এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য। **(তিরমিযী)**

আবূ দারদা (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন ঃ "তোমরা কি প্রতিদিন কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে অপারগ?" সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ

ব্যাপারে আমরা খুবই দুর্বল এবং অক্ষম।" রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন ঃ জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। (মুসলিম, নাসায়ী)

আনাস জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন।" এ কথা শুনে 'উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কেউ যদি আরো বেশী বার পাঠ করে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "আল্লাহ এর চেয়েও অধিক ও উত্তম প্রদানকারী (অর্থাৎ আল্লাহ বেশীও দিতে পারবেন, তাঁর কোনই অভাব নেই।)" (মুসনাদ আহমাদ)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুইশত বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করে তার দুইশত বছরের পাপ মিটিয়ে দেয়া হয়।

(আবূ বাক্‌র বায্‌যার)

বারীদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাসজিদে প্রবেশ কালে দেখেন যে, একটি লোক নামায পড়ছে এবং নিম্নলিখিত দু'আ করছে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ بِأَنِّىْ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ-

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে এ সাক্ষ্যসহ আবেদন করছি যে, আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আপনি এক ও অদ্বিতীয়, আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন, আপনি এমন সত্ত্বা যাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সে সত্তার শপথ! এ ব্যক্তি ইস্‌মে আযমের সাথে দু'আ করেছে। আল্লাহর এ মহান নামের সাথে তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দান করেন এবং এ নামের সাথে দু'আ করলে তিনি তা ক্ববুল করে থাকেন।" (নাসায়ী)

জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "তিনটি কাজ এমন রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এগুলো সম্পাদন করে সে জান্নাতের দরজাগুলোর যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে এবং জান্নাতের যে কোন হূরের সাথে ইচ্ছা বিবাহিত হতে পারবে। (এক) যে ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়, (দুই) নিজের গোপনীয় ঋণ পরিশোধ করে এবং (তিন) প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে দশবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি পাঠ করে।" তখন আবূ বাক্‌র (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ তিনটি কাজের যে কোন একটি যদি কেউ করে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "একটি করলেও একই রকম সম্মান সে লাভ করবে।" **(হাফিয আবূ ইয়ালা)**

'উক্‌বাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করে বললাম ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মু'মিনের মুক্তি কোন 'আমালে রয়েছে?" তিনি উত্তরে বললেন, "হে 'উক্‌বাহ্ (রাঃ) জিহ্বা সংযত রেখো, নিজের ঘরেই বসে থাকো এবং নিজের পাপের কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি করো।" পরে দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি নিজেই আমার সাথে করমর্দন করে বললেন ঃ হে 'উক্‌বাহ্ (রাঃ)! আমি কি তোমাকে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর এবং কুরআনে অবতীর্ণ সমস্ত সূরার মধ্যে উৎকৃষ্ট সূরার কথা বলবো?" আমি উত্তর দিলাম ঃ "হ্যাঁ"। হে আল্লাহ রাসূল ﷺ! অবশ্যই বলুন, আপনার প্রতি আল্লাহ আমাকে উৎসর্গিত করুন! তিনি তখন আমাকে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব এবং সূরা নাস পাঠ করালেন, তারপর বললেন ঃ "হে 'উক্‌বাহ্ (রাঃ)! এ সূরাগুলো ভুলো না। প্রতিদিন রাত্রে এগুলো পাঠ করো।" 'উক্‌বাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ এরপর থেকে আমি এ সূরাগুলোর কথা ভুলিনি এবং এগুলো পাঠ করা ছাড়া আমি কোন রাত্রি কাটাইনি। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাড়াতাড়ি তাঁর হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে উত্তম 'আমালের কথা বলে দিন। তখন তিনি বললেন ঃ "শোনো, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে

তুমি তার সাথে সম্পর্ক মিলিত রাখবে, যে তোমাকে বঞ্চিত করবে তুমি তাকে দান করবে। তোমার প্রতি যে যুল্ম করবে তুমি তাকে ক্ষমা করবে।" **(আহমাদ)**

'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রিকালে যখন বিছানায় যেতেন তখন এ তিনটি সূরা পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌঁছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে ছোঁয়া দিতেন। **(বুখারী, আবূ দাউদ)**

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "আদম সন্তান আমাকে অবিশ্বাস করে, অথচ এটা তার জন্যে সমীচীন নয়। সে আমাকে গালি দেয় অথচ এটাও তার জন্যে সমীচীন ও সঙ্গত নয়। তারা আমাকে অবিশ্বাস করে বলে যে, আমি নাকি প্রথমে তাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছি পরে আবার সেভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবো না। অথচ দ্বিতীয়বারের সৃষ্টির চেয়ে প্রথমবারের সৃষ্টি তো সহজ ছিল না। যদি আমি প্রথমবারের সৃষ্টিতে সক্ষম হয়ে থাকি তবে দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিতে সক্ষম হবো না কেন?" আর সে আমাকে গালি দিয়ে বলে যে, আমার নাকি সন্তান রয়েছে, অথচ আমি একাকী, আমি অদ্বিতীয়, আমি অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। আমার কোন সন্তান-সন্ততি নেই। আমার পিতা-মাতা নেই এবং আমার সমতুল্য কেউ নেই।" (বুখারী)

سُوْرَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ۝ (٢) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ۝ (٣) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ۝ (٤) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ۝ (٥) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ع ۝

সূরা আল-ফালাক্ব (মাক্কী)

(আয়াত–৫, রুকূ'–১)

পরম দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত-১ ঃ আপনি বলুন ঃ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের স্রষ্টার, **আয়াত-২** ঃ তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অপকারিতা থেকে, **আয়াত-৩** ঃ আর অন্ধকার রাত্রির অপকারিতা থেকে, যখন তা গভীর হয়ে সমাগত হয়, **আয়াত-৪** ঃ এবং অপকারিতা থেকে সে সব নারীদের, যারা গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দেয়, **আয়াত-৫** ঃ এবং হিংসা পোষণকারীর অপকারিতা থেকে, যখন সে হিংসা করে।

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ لا (٢) مَلِكِ النَّاسِ لا (٣) اِلٰهِ النَّاسِ لا (٤) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ لا الْخَنَّاسِ ص لا (٥) الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ لا (٦) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ع ❁

সূরা আন্-নাস (মাক্কী)

(আয়াত–৬, রুকূ'–১)

পরম দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত-১ ঃ বলুন ঃ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের; আয়াত-২ ঃ মানুষের মালিকের, আয়াত-৩ ঃ মানুষের মা'বূদের, আয়াত-৪ ঃ তার অপকারিতা থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় আত্মগোপন করে, আয়াত-৫ ঃ যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, আয়াত-৬ ঃ হোক সে জিন জাতীয় কিংবা মানব জাতীয়।

সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস-এর তাফসীর ঃ

'উক্বাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কি দেখোনি যে, ঐ রাত্রে আমার উপর এমন কতকগুলো আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে এমন আয়াত আর কখনো অবতীর্ণ হয়নি।" তারপর তিনি এ সূরা দু'টি তিলাওয়াত করেন। (তিরমিযী, নাসায়ী, তাবারানী)

'উক্বাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ "আমি মাদীনার গলি পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর উটের লাগাম ধরে যাচ্ছিলাম, এমন

সময় তিনি আমাকে বললেন ঃ "এসো এবার তুমি আরোহণ করো।" আমি চিন্তা করলাম যে, তাঁর কথা না শোনা অবাধ্যতা হবে, তাই আরোহণ করতে সম্মত হলাম। কিছুক্ষণ পর আমি নেমে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আরোহণ করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ "হে 'উক্‌বাহ্ (রাঃ) আমি কি তোমাকে দু'টি উৎকৃষ্ট সূরা শিখিয়ে দিবো না?" আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! হ্যাঁ, অবশ্যই আমাকে শিখিয়ে দিন" তখন তিনি আমাকে قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ পাঠ করালেন। অতঃপর উট হতে নেমে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ালেন এবং নামাযে এ সূরা দু'টি পাঠ করলেন তারপর তিনি আমাকে বললেন! হে উক্‌বাহ্ (রাঃ)! আমি সূরা দু'টি পাঠ করেছি তা তুমি লক্ষ্য করেছো তো? শোন, ঘুমোবার সময় এবং ঘুম হতে উঠার সময় এ সূরা দু'টি পাঠ করবে।

(আবূ দাউদ, নাসায়ী)

অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উক্‌বাহ ইবনু 'আমির (রাঃ)-কে প্রত্যেক নামাযের শেষে এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন। **(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)**

'উক্‌বাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) সম্পর্কিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটের উপর তিনিও আরোহণ করেছিলেন। ঐ হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় এও রয়েছে যে, 'উকবাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা দু'টি আমার কাছে তিলাওয়াত করার পর আমাকে তেমন আনন্দিত হতে না দেখে বললেন ঃ "সম্ভবতঃ তুমি এ সূরা দু'টিকে খুব সাধারণ সূরা মনে করেছো। জেনে রেখো যে, নামাযে পড়ার ক্ষেত্রে এ সূরা দু'টির মত কিরাআত আর নেই। **(ইবনু কাসীর)**

'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রিকালে যখন বিছানায় যেতেন তখন তিনি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করে হাতের উভয় তালুতে ফুঁ দিয়ে সারা দেহের যতটুকু উভয় হাতের নাগালে পাওয়া যায় ততটুকু পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাত ফিরাতেন। **(ইবনু কাসীর)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অসুস্থ হতেন তখন এ দু'টি সূরা পাঠ করে তিনি সারা দেহে ফুঁ দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা যখন মারাত্মক হয়ে যেত তখন 'আয়িশাহ্ (রাঃ) "আ'উযুবিল্লাহ" পাঠ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত দু'টি তাঁরই সারা দেহে ফিরাতেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর এরূপ করার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র ও বারাকাতময় হাতের স্পর্শ তারই দেহে পৌঁছিয়ে দেয়া।

(মুআত্তা মালিক)

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এ দু'টি সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এ সূরা দু'টিকে গ্রহণ করেন এবং বাকি সব ছেড়ে দেন। **(তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)**

জিব্রীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ঃ "হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি কি রোগাক্রান্ত?" রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ"। জিব্রীল ('আঃ) তখন নিম্নের দু'আ দু'টি পাঠ করেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللّٰهُ يَشْفِيكَ.

অর্থাৎ "আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি সেসব রোগের জন্যে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্ট ও কু-দৃষ্টি হতে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন।" এ রোগ দ্বারা সম্ভবতঃ ঐ রোগকেই বুঝানো হয়েছে যে রোগে তিনি যাদুকৃত হওয়ার পর আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ-কে সুস্থতা ও আরোগ্য দান করেন। এতে হিংসুটে ইয়াহূদীদের যাদুর প্রভাব নস্যাৎ হয়ে যায়। তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়া হয়। তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যাদু করা সত্ত্বেও তিনি যাদুকারীদেরকে কোন কটু কথা বলেননি এবং ধমকও দেননি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ-কে সুস্থতা ও আরোগ্য দান করেন।

যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর একজন ইয়াহূদী যাদু করেছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক দিন পর্যন্ত অসুস্থ

ছিলেন। তারপর জিব্রীল ('আঃ) এসে তাঁকে জানান যে, অমুক ইয়াহূদী তাঁর উপর যাদু করেছে এবং অমুক অমুক কুঁয়ায় গ্রন্থি বেঁধে রেখেছে। সুতরাং তিনি যেন কাউকে পাঠিয়ে ঐ গ্রন্থি খুলিয়ে আনেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোক পাঠিয়ে তখন কুঁয়া থেকে ঐ যাদু বের করিয়ে আনান এবং গ্রন্থি খুলে ফেলেন। ফলে যাদুর প্রভাব কেটে যেতে শুরু করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ইয়াহূদীকে এ সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি এবং তাকে দেখে কখনো মুখও মলিন করেননি।

(মুসনাদ আহমাদ)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় উম্মুল মু'মিনীন সুফিয়া (রাঃ) তাঁর সাথে রাতের বেলায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺও তাঁকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। পথে দু'জন আনসারীর সাথে দেখা হলো। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর স্ত্রীকে দেখে দ্রুত গতিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে থামালেন এবং বললেন ঃ "জেনে রেখো যে, আমার সাথে যে মহিলাটি রয়েছে এটা আমার স্ত্রী সুফিয়া বিনতে হুওয়াই (রাঃ)।" তখন আনসারী দু'জন বললেন ঃ "আল্লাহ্ পবিত্র। হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ কথা আমাদের বলার প্রয়োজন বা কি ছিল?" রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন ঃ "মানুষের রক্ত প্রবাহের স্থানে শয়তান ঘোরাফেরা করে থাকে। সুতরাং আমি আশংকা করছিলাম যে, শয়তান তোমাদেরকে মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয় না কি।" (বুখারী, মুসলিম)

এমন একজন সাহবী হতে বর্ণিত, যিনি গাধার পিঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। গাধা একটু হোঁচট খেলে ঐ সাহাবী বলে ওঠেন ঃ "শয়তান ধ্বংস হোক।" তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এভাবে বলো না, এতে শায়তান আরো বড় হয়ে যায়, আরো এগিয়ে আসে এবং বলে, 'আমি নিজের শক্তি দ্বারা তাকে কাবু করেছি।' আর যদি 'বিসমিল্লাহ' বলো তবে সে ছোট হতে হতে মাছির মতো হয়ে যায়।" এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র স্মরণে শয়তান পরাজিত ও নিস্তেজ হয়ে যায়। আর আল্লাহ্কে ভুলে গেলে সে বড় হয়ে যায় ও জয়-যুক্ত হয়। (মুসনাদ আহমাদ)

শয়তান সামনের দিকে এগিয়ে আসে। অতঃপর মানুষ হুশিয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পিছনে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা সৎ কাজে এবং শয়তান অসৎ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে) মানুষ যখন আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায় এবং যখন যিক্‌রে থাকে না, তখন তার চঞ্চু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। (মাযহারী)

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

অর্থাৎ, কু-মন্ত্রণাদাতা জ্বিনের মধ্য থেকেও হয় এবং মানুষের মধ্যে থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন-শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ-শয়তান প্রকাশ্যে সামনে এসে কথা বলে। এটা কু-মন্ত্রণা কিরূপে হল? জবাব এই যে, মানুষ-শয়তানও কারও সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সে ব্যক্তির মনে কোন ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এ সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয়ে সে পরিষ্কার বলে না।

জ্বিন-শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কু-কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নাফস্‌ও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন নাফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে ঃ

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ-

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নাফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শির্‌ক থেকেও।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, শয়তান আদম সন্তানের মনে তার থাবা বসিয়ে রাখে। মানুষ যেখানেই ভুল করে এবং

উদাসীনতার পরিচয় দেয় সেখানেই সে কু-মন্ত্রণা দিতে শুরু করে। আর যেখানে মানুষ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সেখানে সে পিছন ফিরে পলায়ন করে। (ইবনু কাসীর)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার মনে এমন সব চিন্তা আসে যেগুলো প্রকাশ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াই আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় (সুতরাং এ অবস্থায় আমি কি করবো?) নাবী ﷺ উত্তরে বললেন ঃ "(তুমি বলবে ঃ)

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ كَيْدَهٗ إِلَى الْوَسْوَسَةِ.

অর্থাৎ "আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যিনি শয়তানের প্রতারণাকে ওয়াস ওয়াসা অর্থাৎ শুধু কু-মন্ত্রণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, বাস্তবে কার্যে পরিণত করেননি।" (ইবনু কাসীর)

وَخِتَامًا عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

সবশেষে নাবী (আঃ)-দের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

Contents

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হুসাইন বিন সোহরাব কর্তৃক রচিত গ্রন্থগুলো পড়ুন

৩৮ নং, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা– ১১০০।
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮, মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩।